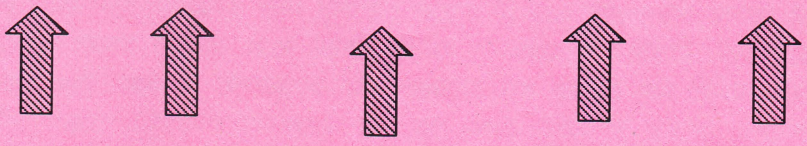


পশ্চিমবঙ্গে

অনুপ্রবেশ

সমস্যা ও সমাধান



মোহিত রায়

পশ্চিমবঙ্গের জন্য
Reclaiming West Bengal

আজ থেকে ২১ বছর আগে ১৯৯৩ সালে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রথম বই লেখেন ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে - নাম 'প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ'। ১৯৯১-র জনগণনার ফলাফল তখন প্রকাশিত হচ্ছে। সেই পরিসংখ্যান জানিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ভয়াবহ অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থা। অমলেন্দু দে-কে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বিভূষিত করাটা কষ্টকর। অমলেন্দুবাবু আজীবন কমুনিস্ট পার্টির একেবারে ঘরের লোক, তাঁর স্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের পরিবারের মেয়ে, নিজে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষক ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। অমলেন্দু দে লিখেছেন -'পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হবার সুযোগ পায়, তাহলে ভারতের সেকিউলার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করার সত্যিই কোন কারণ নেই'।

পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও অনুপ্রবেশের সূচনা

পশ্চিমবঙ্গ শুধু বাংলার পশ্চিম অংশ নয় পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি অমুসলমান বহুত্ববাদী বাঙালিদের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য। ১৯৪৭-এ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৫% মুসলমানেরা চেয়েছিলেন বাংলার পাকিস্তানে যোগদান। বাংলা ভাগ হয়েছিল হিন্দুদের দাবীতে, তারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে বিশ্বাস করেতে পারে নি। তারা যে একশো ভাগ সঠিক তা প্রমাণিত পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৮ শতাংশ নেমে আসায়। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরী হল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। দুই আইনসভাতেই অমুসলিম সদস্যরা বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। বি আর আম্বেদকার দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে ''*সংখ্যালঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।*' দেশভাগের সময় পাঞ্জাবের মত বাংলায় জন বিনিময় হল না। ফলে ভারতীয় পাঞ্জাবে মুসলামান জনসংখ্যা কমে হল ২%। পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রাথমিক শর্তই ছিল অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের এই প্রাথমিক শর্তটিই দীর্ঘদিন ধরে লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। ফলে ১৯৫১-র পশ্চিমবঙ্গের ১৯% মুসলমান আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০%। কেন? এর প্রধান কারণ অনুপ্রবেশ।

অনুপ্রবেশের পথ প্রথম খুলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। ১৯৫০-এ পূর্বপাকিস্তানে শুরু হয় ভয়াবহ হিন্দুনিধন দাঙ্গা। ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিপত্রে (নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি) স্বাক্ষর করেন যেখানে ''দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের ভরসা দেওয়া হয়''। এই চুক্তিতে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের ''অবাধ গতিবিধি'র অধিকারের কথাও বলা হল। এই চুক্তির কারণেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পদত্যাগ করেন। ১৯৫০ সালের ১৪ই এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন, - *'দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ১৬ থেকে ২০ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশ থেকেও প্রায় ১০ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু চলে এসেছে। .....ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতেই থাকবেন, আর যাঁরা আসবে তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না।*

অন্যদিকে যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিল তাঁরা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চুক্তিটির একতরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবেন না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরো বেড়ে যাবে।' অর্থাৎ সেই স্বাধীনতার সময়ের শুরুতেই পূর্বপাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) থেকে ভারতে মুসলমানদের আগমনের পথটি খুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১-৬১ তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শ্যামাপ্রসাদের সতর্কবাণীর সাথে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। পূর্বপাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৩.৩%, আর মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল আরো বেশী ৩৩.৭%! ১৯৬১-৭১-এ হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৫.৭৫%, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৯.৭৬%। ফলে পশ্চিমবঙ্গকে গত ৬৭ বছর ধরে তার পাপ ভোগ করতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের পরিবর্তন, ১৯৫১-১৯৭১

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১-৬১	১৯৭১	১৯৬১-৭১
ধর্ম	*জনসংখ্যা (%)*	*জনসংখ্যা (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*	*জনসংখ্যা (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*
হিন্দু	৭৮.৪৫	৭৮.৮০	৩৩.৩	৭৮.১১	২৫.৭৫
মুসলমান	১৯.৮৫	২০.০০	৩৩.৭	২০.৪৬	২৯.৭৬

অনুপ্রবেশ ১৯৭৭ - জনপ্লাবনের শুরু

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে ভয়ানক সময়টি চলে কমরেড জ্যোতি বসুর আমলে। উদ্বাস্তু আগমনের (ও মুসলিম জনবৃদ্ধির) জন্য ১৯৭১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবসময় ছিল ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বেশী। ১৯৭১-৮১ তে এই হার প্রথম ভারতের বৃদ্ধির হারে নীচে নামে। ১৯৮১-৯১ তে (জ্যোতি বসুর সবচেয়ে রমরমা শাসনকাল) আবার পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের হারের থেকে বেশী হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আসা কখনও বন্ধ হয়নি, তবু হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ: কমেছে এবং ১৯৮১-৯১তেও তা কমেছে। কিন্তু ১৯৮১-৯১তে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার না কমে বরং আরো বেড়ে গেল, ২৯.৫৫% থেকে বেড়ে হল ৩৬.৮৯%।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের পরিবর্তন, ১৯৮১-২০০১

	১৯৮১	১৯৭১-৮১	১৯৯১	১৯৮১-৯১	২০০১	১৯৯১-০১	১৯৫১-২০০১
ধর্ম	*জনসংখ্যা (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*	*জনসংখ্যা (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*	*জনসংখ্যা (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*	*বৃদ্ধির হার (%)*
হিন্দু	৭৬.৯৬	২১.৩৭	৭৪.৭২	২১.০৯	৭২.৪৭	১৪২৩	২৮১.৫
মুসলমান	২১.৫১	২৯.৫৫	২৩.৬১	৩৬.৮৯	২৫.২৫	২৫.৯১	৩৮৭.৭

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধান কি ভয়ংকর বেড়ে চলেছে লক্ষ্য করুন। যা প্রথম দশকে ছিল মাত্র ০.৪% তা বেড়ে হয়েছিল ১৫.৮%!!

পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের বৃদ্ধির হার ১৯৫১-২০০১

	পশ্চিমবঙ্গ	***বাংলাদেশ***
হিন্দু	*২৮.১৫ %*	*২৩.১৬ %*
মুসলমান	*৩৮৭.৭ %*	*৩৪৪.৬৮ %*

আর আমাদের সহোদর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের কি অবস্থা? গত পঞ্চাশ বছরে (১৯৫১-২০০১) তারা বেড়েছেন ২৩ শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানরা বেড়েছে ৩৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ১৭ গুণ। এই অন্যায়ের প্রতিকার না হলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকবে না।

কিন্তু কেন এরকম হল? পূর্বপাকিস্তান / বাংলাদেশে হিন্দুরা ইসলামি অত্যাচারে বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেছে, এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু হয়েছে উল্টোটাই। আর এসবের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ১৯৭১-এর পর থেকেই। **কারণ - অনুপ্রবেশ।**

অনুপ্রবেশকারী কারা?

বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু ও মুসলমানরা ভারতে আসেন তারা কি উদ্বাস্তু না অনুপ্রবেশকারী? এ ব্যাপারে কোন রকম বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। ১৯৫১-এর রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে যা ১৯৬৭-র প্রোটোকলে সংশোধিত হয় তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে - *'যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হবার জন্য নিপীড়িত হবার যথেষ্ট উপযুক্ত আশংকা রয়েছে বলে তার নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরের দেশে রয়েছেন; অথবা এই ভীতির জন্য তার দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন; অথবা এই সব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।'* রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ীই বাংলাদেশ থেকে চলে আসা নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা উদ্বাস্তু। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু কাদের বলে এটা সবাই জানেন। রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু দপ্তর আছে। এই উদ্বাস্তুরা সবাই এসেছেন পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে। বাকিরা অর্থাৎ **বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানরা হচ্ছেন অনুপ্রবেশকারী।** আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বারংবার বলেছেন।

অনুপ্রবেশকারী - কত?

অনেকে অবাক হবার নাটক করলেও অনুপ্রবেশ কথাটি প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতি, প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা মহলের খুব পরিচিত শব্দ। এ রাজ্যের দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজেই সি পি আই এম-এর মুখপত্র গণশক্তির ১১ই অক্টোবর, ১৯৯২ সংখ্যায় 'অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রয়োজন' নিবন্ধে লিখছেন - *''১৯৭১ থেকে*

মুসলমানরাও ভারতে আসতে শুরু করলো। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশীকে সনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান''। লক্ষ্য করুন সরকারী ভাষ্যেই ১৫ বছরে সাড়ে চার লক্ষ বাংলাদেশীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রায় ৭৫ শতাংশ মুসলমান অর্থাৎ প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী।

সিকি শতাব্দী জমিয়ে রাখা এই সমস্যা এখন দানবিক রূপ নিয়েছে। ভারতের প্রথম কমুনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৬ মে, ১৯৯০-এ লোকসভায় জানান যে ভারতে ১ কোটি বেআইনী বাংলাদেশী রয়েছে। ১৪ জুলাই, ২০০৪-এ লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বেআইনী বাংলাদেশী রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৭ লক্ষ বেআইনী বাংলাদেশী। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হিসাব বলে সংখ্যাটি অনেক কম। এর মধ্যে কতজন উদ্বাস্তু ও কতজন অনুপ্রবেশকারী? এসব নিয়ে গবেষণা করাটা সাম্প্রদায়িক ফলে কোন সঠিক সংখ্যা কারো কাছে নেই। তবে বাংলাদেশের উধাও জনসংখ্যা, সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশীদের তথ্য, বিভিন্ন জেলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি - এইসব থেকে ধারণা করা যায় পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি, রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ।

অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করেছে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে১৯৫১-র ১৯ শতাংশ মুসলমান আজ ৩০ শতাংশের বেশী হয়ে দুএক দশকের মধ্যেই অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও লঙ্ঘন করবে। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি অমুসলমান বহুত্ববাদী বাঙালিদের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক, আইন-শৃঙ্খলা, নারীদের নিরাপত্তা, সংস্কৃতি চর্চা - সব কিছুই ইসলামি আক্রমণের প্রভাবে বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতি আজ নিয়ন্ত্রণ করছে মুসলমান ভোট। কে কত মুসলমান ভোট পেতে পারে এর প্রতিযোগিতায় নেমেছে সব স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দল। পশ্চিমবঙ্গে এখন কোন দলে কত মুসলমান যোগদান করল তাই হয়ে উঠছে দলের কৃতিত্ব। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করছেন বাংলাদেশী নাগরিকেরা। এমনকি সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান আদৌ ভারতীয় নাগরিক কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। একটু খোঁজ করলে অনেক বিধায়ক, পঞ্চায়েত সদস্যরাও দেখা যাবে আদৌ ভারতীয় নাগরিকই নন।

১৯৭৭এ পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার এসেই ইসলামি শিক্ষার বাহন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। রাজ্যের বাৎসরিক সাফল্যের খতিয়ানে আরো মাদ্রাসা স্থাপন ও আরো রাজ্যের অর্থ সংস্থান উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পেল। যখন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানচালিত স্কুলগুলির (যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিয়ার্স ইত্যাদি) পঠনপাঠন চলে বিভিন্ন অধর্মীয় সিলেবাসে (যেমন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন, ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন ইত্যাদি), তখন কেন মুসলমান ছাত্ররা একটি ধর্মীয় সিলেবাসে পড়বে, কেন তারা কয়েক বছর ধরে কোরান হাদিস স্কুলে পড়বে, ইসলামের বিজয় গাথা পড়বে - এই

সাধারণ যুক্তিটি সম্পর্কে সারা পশ্চিমবঙ্গ নীরব। ইসলামি সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিক আঁতুড়ঘর পাকিস্তানেই মাদ্রাসাগুলির কার্যক্রম নিয়ে মাঝে মাঝেই ভয়ানক খবর প্রকাশিত হয়, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে মাঝেমাঝেই মতামত জানান। ২০১১তে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ হাজার মাদ্রাসাকে সরকারি সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন মাদ্রাসা শিক্ষার জোয়ার।

শিক্ষার এই ইসলামিকরণের ঢেউয়ে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যা একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। আরবী ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের অঙ্গ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও তা পড়তে হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা খোলা হয়েছে। পাকিস্তান ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্রষ্টা আগা খান পরিবার। আগা খান তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন - '*স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েই*' ।

এই মাদ্রাসা সংস্কৃতির রমরমা থেকেই শুরু হয়েছে এখন ইসলামি হামলার দাপট। যার দাপটে পশ্চিমবঙ্গে থাকাকালীন তসলিমা নাসরিনকে মেদিনীপুর থেকে শিলিগুড়ি - কোথাও কবিতা পাঠ করতে দেওয়া হয় নি। তারপর ২০০৭-এর ২১ নভেম্বর কলকাতার বুকে মারদাঙ্গা করে তসলিমা নাসরিনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করা হল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির নির্ধারক হলেন ইসলামি ইমামরা। ২০১২তে এই ইমামাদের মাসিক সরকারি আনুদান দেওয়া শুরু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০-এ দেগঙ্গায়, ২০১৩তে ক্যানিংয়ে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা একতরফা হিন্দু বাড়িঘর দোকানপাট জ্বালালো। কারো কোন বিচারতো দূরের কথা কেউ গ্রেপ্তার হল না। আর নীরব থাকলো একটি বাদে সব বড় দল এবং হিন্দু বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি।

মুসলমান জনসংখ্যা যত বাড়বে এই ইসলামি দাপট বাড়বে, রাজনৈতিক দলগুলি তত মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করবে, পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব তত বিপন্ন হবে। **সুতরাং প্রয়োজন অনুপ্রবেশ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান।**

অনুপ্রবেশ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান

সমস্যাটি বিপুল। পশ্চিমবঙ্গে এখনই ১ কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, আগামী দিনে আরো আসবে। এই অনুপ্রবেশকারীরা এমনি এমনি চলে আসে নি এদের ভারতে আসার ও থাকার জন্য এদেশেই একটি বড় সাহায্যকারী শক্তি রয়েছে। এরা কংগ্রেস, তৃণমূল, কমুনিস্ট - সব দলের সমর্থনেই এই দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালায়। এই অনুপ্রবেশকারীরা অনেকেই এদেশে কুড়ি ত্রিশ বছর থেকে এখানে শিকড় গভীরে প্রবেশ করিয়েছে। এর জন্য স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের অন্তত দুটি হিন্দুপ্রধান জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে গেছে। অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনমানচিত্র এত ভয়াবহভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটিই প্রায় বিনষ্ট হতে বসেছে। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কয়েক কিলোমিটার এখন অনুপ্রবেশকারীদের দখলে। প্রতি বছর হাজার হাজার গরুপাচার এই অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা করার জন্য কোটি কোটি টাকা

জোগাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা যে এই অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস, তৃণমূল, কমুনিস্ট, নকাশালপন্থী, দলিত-মুসলিম জোট সবাই এককাট্টা। পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ বাম ও সেকুলার অ্যাকাডেমিক মহল ও এদের প্রভাবে মিডিয়ার এক বড় অংশ অনুপ্রবেশ সমস্যাকে চেপে রাখবার এবং এখন বিভ্রান্ত করাবার জন্য সচেষ্ট।

এত বড় জটিল সমস্যার সমাধান সরকারি দপ্তর বা শুধু আইনকানুনের কাজ নয়। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অনুপ্রবেশকারীদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করা। এই অনুপ্রবেশকারীদের না বিতাড়িত করতে পারলে এবং অনুপ্রবেশ না বন্ধ করতে পারলে যে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই আর থাকবে না, এটি বাংলাদেশে পরিণত হবে - এই সত্যটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পৌছানোর জন্য প্রয়োজন একটি জন আন্দোলন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামি অত্যাচারের কারণে আগত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা যে উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী নন - এই সত্যটিও প্রচারের প্রয়োজন না হলে ইতিমধ্যেই বিশেষতঃ তৃণমূল কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশকারী বলে মিথ্যা ভয় দেখাতে শুরু করেছে। এছাড়া সরকার অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে যে সব পদক্ষেপ নেবে তার সমর্থনেও জন আন্দোলন প্রয়োজন নইলে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে যথেষ্ট সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে, আইন শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হুজুক তুলে সরকারি সমস্ত প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে দেবার ঘটনা ঘটবেই। বর্তমান রাজ্য সরকার এইসব ঘটনাকে সমর্থন করবেন। আমরা দেখেছি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের দাবীতে ইসলামি মৌলবাদীরা বিনা বাধায় সারাদিন ধরে কলকাতায় যে লুটপাট-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ চলায় তাকে তৎকালীন বামপন্থী সরকার থামানোর কোন চেষ্টাই করেনি। এই অরাজকতাকে কংগ্রেস তৃণমূল সমর্থন করেছিল এবং পরে তৃণমূল সরকার এই দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেয়। একমাত্র শক্তিশালী জন আন্দোলন এই দেশবিরোধী সহিংস শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারে।

অনুপ্রবেশ সীমান্তে বন্ধ করা অনেকটাই প্রশাসনিক ব্যাপার কিন্তু গুছিয়ে বসা অনুপ্রবেশকারীদের হটানো শুধু আইনি হুকুমে হবে না। এই অনুপ্রবেশকারীদের শক্তির উৎস ও রুজিরোজগারের পথগুলি বন্ধ করতে পারলে অনুপ্রবেশকারীরা এখানে থেকে যাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এর জন্য সরকার কি করতে পারে?

প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ জনগণনা শুরু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে নাগরিকত্ব পরিচয়পত্র চালু করতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গে তা করতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে। সমস্ত সন্দেহভাজনকে প্রাথমিকভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না এবং তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে সাময়িক ভাবে বাদ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এখন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেকেই বিদেশীদের ভোটে নির্বাচিত, এমনকি অনেক অনুপ্রবেশকারীরাও নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ - নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে এইসব সন্দেহভাজনকে ভোটার তালিকা থেকে আপাততঃ বাদ দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। ভোটার তালিকা থেকে ৭০-৮০ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমানের নাম বাদ গেলে আর নির্বাচনে মুসলমান ভোটের জন্য লালায়িত হতে হবে না কোন দলকেই।

তৃতীয়তঃ - এইসব সন্দেহভাজনকে কোন সরকারি ভরতুকি যেমন ১০০ দিনের কাজ, রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি সুবিধা থেকে বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সন্দেহভাজনদের দুটি তালিকা করা যেতে পারে - কম সন্দেহভাজনদের কিছু সরকারি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।
চতুর্থতঃ - কোন সন্দেহভাজনকে সরকারি কাজে নিয়োগ করা যাবে না। যেসব সন্দেহভাজন এখন সরকারি দপ্তরে কর্মরত, আইনী পরামর্শ নিয়ে তাদের নিয়োগ বাতিল করার কাজ শুরু করতে হবে।
পঞ্চমতঃ - কাউকে কাজে নিয়োগ করার সময় তাঁর নাগরিক পরিচয়পত্র দেখে নিতে হবে। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজনকে নিয়োগ করলে তা পুলিশকে জানাতে হবে। অনুপ্রবেশকারী প্রমাণিত কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করলে নিয়োগকারীরও শাস্তি হবে।
ষষ্ঠতঃ - পশ্চিমবঙ্গ - বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ৩০ কিলোমিটার প্রস্থ অঞ্চলের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন চালু করে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে মৌলবাদী কাজকর্ম, যথেচ্ছ ধর্মস্থান নির্মাণ, গরু পাচার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। বিশেষতঃ বিএসএফের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।
সপ্তমতঃ - অনুপ্রবেশকারী প্রমাণ হবার পর সেই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের সব দলের সরকারই অনুপ্রবেশ স্বীকার করতে চায় না। এজন্য প্রয়োজনে তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করতে হবে।

এইসব কঠোর নজরদারি শুরু হলে ও তার সমর্থনে তীব্র জন আন্দোলন জারী রাখলে অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় অংশ নিজেরাই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে শুরু করবে, নতুনরা আর আসতে উৎসাহ পাবে না।

অবশ্যই এসব করা সোজা নয়। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭ -এ কলকাতায়, ২০১০-এ দেগঙ্গায় ও ২০১২তে ক্যানিংয়ে আমরা একতরফা মুসলমান দুষ্কৃতকারীদের হিন্দু ঘরবাড়ি দোকান সম্পত্তি ধ্বংস করতে দেখেছি, দেখেছি রাজ্য সরকার কিভাবে নীরব থেকেছে, নীরব থেকেছে সব বড় রাজনৈতিক দল, মিডিয়া । এমনকি বড় হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলি যাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত রয়েছে, রাজ্যের প্রভাবশালী মহলে যাদের যথেষ্ট খাতির, তারাও নীরব থেকেছে। তখন এটা পশ্চিমবঙ্গ না বাংলাদেশ তা ভাবতে হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্র (বা রাজ্য সরকার) যদি অনুপ্রবেশ বন্ধে এসব কাজ করতে শুরু করে তবে অনুপ্রবেশকারীদের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক কাজের উসকানি থাকবেই, সরকারি নজরদারদের উপর আক্রমণ ঘটবে, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা দেওয়া হবেই। একমাত্র অনুপ্রবেশ বিরোধী তীব্র জন আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে একজোট করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার এটাই হবে শেষ ও নির্ণায়ক সংগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলতেন জিন্না ভারত ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি। এই সংগ্রামে পরাজিত হলে পশ্চিমবঙ্গ আবার পাকিস্তান হয়ে উঠবে।

প্রয়োজন একটি জন আন্দোলন
অনুপ্রবেশ বিরোধী জন আন্দোলন কি করবে? এখনি সরকার হয়ত কিছু পদক্ষেপ নেবে না কিন্তু তা নিতে জনমত গড়ার কাজটিই হবে আমাদের প্রথম কাজ। জনমত গড়তে -

১) ভাল প্রচার পুস্তিকা লেখা, দেওয়াল লিখন, পোস্টার প্রদর্শনী ও জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার।

২) অনুপ্রবেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ যে ইসলামি উগ্রপন্থীদের রাজত্ব হয়ে উঠছে তার বিপদ ভাল করে প্রচার করা।

২) সারা রাজ্যে কয়েকশো পথসভা করা।

৩) উদ্বাস্তু অঞ্চলে সভা করে ও প্রচারপত্র বিলি করে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীর তফাৎ বোঝানো।

৪) উদ্বাস্তু আন্দোলনকে অনুপ্রবেশ বিরোধী জন আন্দোলনে যুক্ত করা।

৫) কয়েকটি বড় বড় সভা মিছিল করা।

এই কাজে যেমন ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসতে হবে, তার সাথে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলিকেও এই দায়িত্ব নিতে হবে। সবচেয়ে প্রয়োজন হবে বড় ধর্মীয় সংগঠনগুলি যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, লোকনাথ মিশন, অনুকুল সৎসঙ্গ, রাম ঠাকুরের ভক্তদল, মতুয়া মহাসংঘ - এরকম সবাইকে এই আন্দোলনে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সংকট এড়াতে হলে এই মহা আন্দোলনের এখনই বড় প্রয়োজন।

২ অক্টোবর, ২০১৪ - গান্ধীজয়ন্তী ও দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের পর এবং পরবর্তী ঘটনাক্রমে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে -

- পশ্চিমবঙ্গ এখন জামাতপন্থী ইসলামি মৌলবাদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের একজন সাংসদ নিজেই এই জামাত গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত।
- তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশয়ে পুলিশ ও প্রশাসনে এখন জামাতপন্থীরা খুব সক্রিয়।
- অনুপ্রবেশের ফলে এখন ইসলামি মৌলবাদীরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জনবলে বলীয়ান।

আর ঘরে বসে টিভি আর সংবাদপত্রে বিবৃতি নয়, দু একটা মিছিল নয়,
প্রয়োজন রাজ্য জুড়ে কর্মসূচি, মোড়ে মোড়ে পথসভা,
ইসলামি মৌলবাদকে সরাসরি আক্রমণ,
রাজ্যের সব অনুমোদিত মাদ্রাসা ও খারিজি মাদ্রাসাকে অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী তোলা,
যে কোন আক্রমণ হলে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করা -
এই আমাদের বাঁচবার শেষ সুযোগ এরপর সব অন্ধকার।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি প্রচার আন্দোলন

- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* মানুষকে জানাবে যে ১৯৪৭ সালে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল অমুসলমান প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য হিসাবে। আগামী কয়েক দশকে জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তনে অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকবে না মনে করা হচ্ছে। এর জন্য এখনই সবাইকে ভাবতে হবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* উদ্বাস্তু আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের একটি সামাজিক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অন্চলে তা নিয়ে প্রচার চালাবে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* সমস্ত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবীতে প্রচার করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* একটি বিশেষ জনগণনার দাবী করবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে বিতাড়নের কাজ শুরু করা যায়।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* মনে করে ১৯৫০ সালের পর আসা নেপালিদের জনগণনা করে গোর্খাল্যান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য প্রচার করবে। মাদ্রাসা বোর্ড অবলুপ্ত করা, পশ্চিমবঙ্গে আলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার দাবী করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রচার করবে। রাজ্যে শিল্পের প্রসার, জমির জন্য ন্যায্য দাম প্রদান, উন্নত কৃষির প্রসার, উন্নত পরিবেশের জন্য প্রচার করবে।
- পশ্চিমবঙ্গের জন্য সমাজের দরিদ্র অংশ বিশেষতঃ দরিদ্র তফসিলি জাতি, উপজাতি, ধর্মীয় ও ভাষভিত্তিক সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারের প্রচেষ্টা করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* রাজ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা হিংসাত্মক ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে দ্রুততার সঙ্গে প্রচার চালাবে। পশ্চিমবঙ্গে সেই ধরণের ধর্মীয় উন্মাদনা ও হিংসার ঘটনা প্রায়শই ঘটতে শুরু করেছে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনবার জন্য দাবী করবে।
- *পশ্চিমবঙ্গের জন্য* বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য : Reclaimimg West Bengal

যোগাযোগঃ ৭২৭৮৫৩৫১৪৩